সুশাসন ও বাংলাদেশ
(Good Governance and Bangladesh)

সু-শাসন হচ্ছে এক ধরণের শাসন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে চর্চা করা হয়। এই শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণ স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সরকারের নীতি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত থাকে এবং নারী -পুরুষ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করে। আর্থ-রাজনৈতিক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশে পুঁজিবাদের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হরতাল-অবরোধ রাজনীতির নিত্য সঙ্গী। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দুর্নীতির হার অত্যন্ত উচ্চ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন হলেও বাংলাদেশে সুশাসনের মাত্রা সন্তোষজনক নয়। বর্তমান ইউনিটে সুশাসনের ধারণা, সূচক, উপাদান, বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

সুশাসনের ধারণা (Concept of Good Governance)

সাধারণত শাসন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও তা বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। শাসনের ধারণা কোন নতুন বিষয় নয় বরং এটা মানব সভ্যতার মতোই পুরাতন। শাসন ব্যবস্থার অর্থ ও মাত্রা সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। সুশাসন শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন : আন্তর্জাতিক শাসন, জাতীয় শাসন, স্থানীয় শাসন, যৌথ শাসন ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে সুশাসনকে একটি দেশের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদানকারী হিসেবে দেখা হয়। সুশাসন প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে শাসন বলতে কি বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। শাসন বলতে বুঝায় ক্ষমতাকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, কিভাবে জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রতি সাড়া প্রদান করা হয় কিংবা কিভাবে একটি জনসমষ্টি শাসিত ও পরিচালিত হয়। সাধারণ অর্থে সুশাসন হল এমন এক প্রক্রিয়া যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এই শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সঙ্গে নিশ্চিত হয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ। সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক। এটি ৪ ধরণের ধারণা নির্মাণ করে: রাজনৈতিক সুশাসন, সামাজিক সুশাসন, অর্থনৈতিক সুশাসন এবং সাংস্কৃতিক সুশাসন।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ও শাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন সব ক্ষেত্রেই সুশাসন জরুরি। তৃতীয় বিশ্বে সুশাসনের সমস্যাকে সব সমস্যার মূল কারণ হিসাবে সনাক্ত করেছে দাতারা। তাদের মতে, এসব রাষ্ট্রে সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। তবে এর থেকেও বড় সমস্যা হল সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি। একটি বহুমুখী ধারণা হিসাবে (Multi-dimentional) সুশাসনের উদ্ভব হয় মূলত ১৯৮৯ সালে। বিশ্বব্যাংক প্রথম এই ধারণা উপস্থাপন করে। 'সবুজ বিপ্লব' আর 'কাঠামো সমন্বয় কর্মসূচি'র ব্যর্থতার পর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) উন্নয়নের শর্ত হিসাবে এ ধারণার অবতারণা করে। মোটা দাগে সুশাসনের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হল-(ক) রাজনৈতিক: গণতন্ত্র ও সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, (খ) অর্থনৈতিক: মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণ, (গ) সামাজিক-সংস্কৃতিক: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার এবং (ঘ) তথ্য ও প্রযুক্তি: বিশ্বজুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার। **সুশাসনের সংজ্ঞা** বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমাজের সমস্যা ও চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। সংস্থাটি সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Governance is the manner in which power is exercised in the management of a

countries economic and social resources for development." UNDP এর মতে, সুশাসন হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিধিবদ্ধ চর্চা যার মাধ্যমে একটি দেশের
উন্নয়ন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। আর এ চারটি স্তম্ভ হল- দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিতে আলোচনা করা হল-

বিশ্বব্যাংকের ধারণায় সুশাসনের স্তম্ভসমূহ

দায়িত্বশীলতা	স্বচ্ছতা	আইনি কাঠামো	অংশগ্রহণ
দক্ষতা নির্মাণ	তথ্য প্রবাহ	আইন প্রয়োগ	অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রভাবিত
সরকারি খাত ব্যবস্থাপনায়	তথ্য উন্মুক্তকরণ	আইন ও উন্নয়ন	গোষ্ঠির অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় এবং
দক্ষতা আনয়ন	ই-তথ্য সেবা প্রতিষ্ঠা	বেসরকারি খাতের উন্নয়নে	সেবামূলক কর্মকান্ডের
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	দুর্নীতি প্রতিরোধে	আইনি কাঠামো	বিকেন্দ্রিকরণ বেসরকারি
আমলাতন্ত্রের সংস্কার	কার্যকর পদক্ষেপ	মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ	সংগঠনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

তথ্য: বিশ্বব্যাংক (১৯৮৯) সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সু-শাসন হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যার মাধ্যমে নাগরিক নিজের সাথে এবং সরকারি কর্মকর্তা বা এজেন্সির সাথে একত্রে কাজ করতে পারে, যাতে নাগরিকদের আত্ন-মর্যাদা উপলব্ধিতে সমর্থন যোগায় ও আর্থসামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাবার জন্য নব্বই দশকে শাসন ব্যবস্থায় একটি নতুন ধারণার অবতারণা হয়েছে। আর এই ধারণাটি হল নানা ধরণের এজেন্সি ও দাতাসংস্থা প্রদত্ত সুশাসন সম্পর্কিত ধারণা।

সুশাসনের উপাদানসমূহ (Elements of Good Governmence)

যে শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ গনতান্ত্রিক উপায়ে সুনিশ্চিত হয় তাকেই সুশাসন বলে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে সুশাসনের চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল: সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জবাদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা। ইউনেস্কো (UNESCO) সুশাসনের উপাদনের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের উপাদানগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। ইউএনডিপি (UNDP) সুশাসনের ৫টি মূল উপদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল; বৈধতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও সাম্য। আইডিএ (International Development Agency) সুশাসনের চারটি মূল উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন ও অংশগ্রহণ।

নিম্নে সুশাসনের প্রধান উপদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হচ্ছে সুশাসনের প্রধান উপাদান। এটি সরকারের স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের উপর নির্ভর করে। জবাবদিহিতার মাধ্যমেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই নয় বরং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের জবাবদিহিতাও আবশ্যক। দুর্নীতি কমাতে ও রাজনৈতিক উন্নয়নে জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, আইন ও নীতি মান্য করে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা হয় তখন তাকে স্বচ্ছতা বলে। সিদ্ধান্ত

বা পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে সহজেই সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। স্বচছতা প্রতিষ্ঠা পেলে সরকারি অর্থ ব্যয়ে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যায়।

২. অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম একটি উপাদান। সুশাসনের মূল ভিত্তি নারী এবং পুরুষ উভয়রেই অংশগ্রহণ। বিশ্বব্যাংক মনে করে, সকলের অংশগ্রণের মাধ্যমেই কার্যকরী উন্নয়ন সম্ভব। অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে অধিক ক্ষমতাশীল করা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে ভোটদান।

৩. আইনের শাসন

সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আইনের শাসন। এটি একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বৈধ উপকরণ। মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আইনের শাসন। প্রশাসনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন থাকা দরকার। আইনের মাধ্যমেই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ও আধিপত্য রোধ করা যায়। আইন হতে হবে অবশ্যই নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রের সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের আইনের প্রধানতম উৎস।

৪. নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা

পক্ষপাতহীন অবস্থা বা নিরপেক্ষতাই পারে সুশাসন নিশ্চিত করতে। সুশাসন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। নিরপেক্ষতা আসতে হলে মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকুরি দিহে হবে। অন্যদিকে, দায়িত্বশীলতা না থাকলে কখনোই কোন কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। একমাত্র দায়িত্বশীলতাই পারে সঠিকসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে।

৫. জনপ্রশাসনের উৎকর্ষতা ও বিকেন্দ্রীকরণ

সুশাসন আনয়নের জন্য জনপ্রশাসনের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এই উৎকর্ষ সাধন করার জন্য জনপ্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও গতানুগতিক ধারা থেকে বের হতে হবে। জনপ্রশাসনের উৎকর্ষতা সাধন বলতে বোঝায় জনপ্রশাসনে দক্ষতা আনয়ন, প্রযুক্তি ব্যবহারকরণ ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা। সুশাসনের আরেকটি উপাদান হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই সকল বিভাগ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এটি প্রশাসনের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা কমিয়ে দেয় এবং প্রশাসনকে জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতিটি বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

পরিশেষে বলা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সকলের কাম্য, কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সদিচ্ছার পাশাপাশি জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা
(The State of Good Governance in Bangladesh)

বাংলাদেশে সুশাসন সর্বজন গ্রাহ্য স্লোগান হলেও তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি করে না। রাজনৈতিক নেতারা কার্যত জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। তাছাড়া নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তেরি হয় পদে পদে ঘুষ দেবার সংস্কৃতি। প্রশাসনের অনেক জটিল ও কঠিন কাজ আমলারা অতি সহজে পরিচালনা করতে পারে। কারণ প্রশাসনিক কার্যক্রমে তাঁরা অনেক অভিজ্ঞ ব্যাপক। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কজে লাগিয়ে আমলারা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভাবিত করতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস পাবার আশঙ্কা থাকে। প্রশাসনিক দলীয়করণ এ অবস্থাকে আরো খারাপ করে । সকল রাজনৈতিক দলই প্রশাসনকে নিজেদের আত্নরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য লোক নিয়োগ পায় না। নিয়োগ পেলেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পায় না। আর এ কারণে রাষ্ট্র একদিকে মেধাবী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তা দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরনো, অপর্যাপ্ত ও অপ্রাসঙ্গিক বহু আইন একটি বড় বাধা। জনসাধারণের পক্ষে এ সকল আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও যথার্থ অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণে আমলারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনাচার বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, যা সুশাসনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। রাজনীতিবিদ ও আমলারা যদি দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ব্যাপার। সুশাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারও এ প্রক্রিয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে। গত চারটি সংসদীয় সরকারেরও এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতা ছিল। সুশাসনের আধুনিক ধারণা হল নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিচার বিভাগই চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠান। তাই সুশাসনের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ অত্যাবশ্যক। সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থকলেও বাংলাদেশে নিম্ন আদালত এখনও পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি।

দেশী-বিদেশী অনেক গবেষক দাবি করেন, বাংলাদেশ সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল দুর্নীতি। সুশাসনের পূর্ব শর্ত হল সরকারের সকল কার্যকলাপ থেকে দুর্নীতি দূর করা। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফলত বাংলাদেশে মানবাধিকার মারাত্নকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। গত তিন দশক ধরেই এ অবস্থা চলছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড করে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ নির্বিচারে সাধারণ মানুষ আটক করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদির যোগান দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাবে বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত সুশাসন অর্জন করতে পারছে না। বাংলাদেশের জনগণ ব্যাপক হারে ভোট দিলেও তা 'নিছক অংশগ্রহণ'-কে প্রকাশ করছে। নিছক অংশগ্রহণ বলতে বোঝানো হচ্ছে জনগণ শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেয় কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারা কেবল ভোট দেয়, সরকারের নীতি নির্ধারণে জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন ধরণের সমঝোতা না হওয়াও সুশান প্রতিষ্ঠায় একটি অন্তরায়।

বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ
(Obstacles of Good Governance in Bangladesh)

বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক বেশি। বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমস্যা বাংলাদেশের সুশাসনের পথে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জবাবদিহিতার অভাব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাবের জন্য কিছু বিষয় কাজ করে। এগুলো হল: প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্বল সংসদ, অনুন্নত রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব এবং দুর্বল নির্বাচন ব্যবস্থা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংসদে কোন শক্তিশালী বিরোধীদল ছিল না। এ কারণে সংসদ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না। আমলারা অনেক সময় জনগণের সামনে সঠিক ও সত্য তথ্য প্রচার করতে চায় না। শাসক শ্রেণীরও একটি অংশ তথ্য গোপনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এই অস্বচ্ছতা দুর্নীতির জন্ম দেয় এবং সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

২. অংশগ্রহণের অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাব। জনগণের অংশগ্রহণ না থাকলে কখনোই যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করা যায় না। জনগণের মতামত বা অংশগ্রহণ ভোটদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা কোন সমস্যা সমাধানে জনগণের মতামত নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ একেবারেই কম।

৩. আইনের শাসনের অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আইনের শাসনের অভাব। বাংলাদেশে আইনের শাসনের অভাব তো রয়েছেই; তাছাড়া এখানে যে আইনগুলো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর সঠিক চর্চা করা হয় না।

৪. বিকেন্দ্রীকরণের অভাব

সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ একটি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দারস্থ হতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পারে নি। এখানে সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ ও তা বাস্তবায়ন হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে।

৫. দুর্নীতি

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। জনগণের সরকারি সুযোগ-সুবিধা কমে যাচ্ছে। ক্ষমতাবান কিছু ব্যক্তি ফায়দা লুটছে। বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত টানা পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাত, ভূমি প্রশাসন, জন প্রশাসন, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ সেক্টর, স্থানীয় সরকার- এক কথায় বাজার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির সংস্কৃতি লক্ষণীয়।

৫. মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। শিশু ও নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার লঙ্ঘন, শিশুশ্রম এবং নাগরিকের স্বাধীনতাহরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ। প্রত্যেক সরকারই সন্ত্রাসীদের বিচারের পরিবর্তে ক্রস-ফায়ারের মাধ্যমে মেরে ফেলছে। তাছাড়া গুম, অপহরণ বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেকটি বাধা।

৬. আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্বল সুশীল সমাজ

রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে আমলাদের কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমতা ও নীতিমালা প্রয়োগ করছে। দেশের সুশীল সমাজ অত্যন্ত দুর্বল। তারা অনেক বিষয়ে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে সরকারের বিভিন্ন অন্যায় কার্যক্রমের সমালোচনা না করে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ কার্যত সরকার ও বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলত সুশীল সমাজ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৮. দারিদ্র্য ও নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী এ সকল লোক বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। এটি সুশাসনের জন্য একটি বড় বাঁধা। উপরন্তু তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকার রক্ষা করা সরকারের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে দারিদ্র্য নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। ৯. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব** সুশাসনের জন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ পুরো কার্যকর হয়নি। উচ্চ আদালত স্বাধীনতা ভোগ করলেও নিম্ন আদালত কার্যত শাসন বিভাগের অধীন।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়
(Measures to Establish Good Governance in Bangladesh)

বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায় রয়েছে। দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার, শাসনরীতির অনিয়ম, প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার স্বাভাবিক চিত্র। এ ক্ষেত্রে যদি সরকার সংসদকে কার্যকরি করার যথাযথ পদক্ষেপ নেয় এবং সংসদ তার কার্যকর ভূমিকা পালন করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নিম্নে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় আলোচনা করা হলঃ

১. দূর্নীতি প্রতিরোধ

দুর্নীতি সুশাসনের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রকল্পে দূর্নীতি , সরকারি রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতি, সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, ভূমি জরিপে দুর্নীতি প্রভৃতি। অতএব, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

জবাবদিহিতা বলতে আমরা বুঝি নিজের কাজ সম্পর্কে অন্যের কাছে ব্যাখ্যা প্রদান করা। বাংলাদেশের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এনজিওদের ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি

বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে এনজিগুলোকে স্থান দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে শাসনের মূল দায়িত্ব সরকারের নির্বাহী বিভাগের ওপর। এখানে এনজিগুলোকে কাজ করতে হয় সরকারের বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধের আওতায়। তাই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনজিগুলোকে তাদের ভূমিকা পালনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। **৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা** পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত বিচার ব্যবস্থার আওতায় অথবা বিশেষ বিচারের আওতায় আমলাদের অন্যায় বা দুর্নীতির বিচারের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। আর এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় সুশাসন। **৫. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ** মানুষের বাকস্বাধীনতা ও জনগণের সচেতনতার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কোন কোন সরকার গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করে, যা সুশাসনের অন্তরায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের ত্রুটি কিংবা দুর্নীতি জনগণের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে। এছাড়াও প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। উপরন্তু প্রচারমাধ্যম দুর্নীতি রোধ ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে ভূমিকা রাখে। তাই প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬. নারীর ক্ষমতায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে পুরুষ ও মহিলা নাগরিকদের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.খ)। বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, বাল্য বিবাহ রোধ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী আহত হয়েছেন, এমনকি মারা পর্যন্ত যায়। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণের অর্ধেক অংশকে ক্ষমতা থেকে দূরে রেখে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

৭. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিককীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- রাজনৈতিক দল, সংসদ, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি যদি তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে, তবে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

৮. রাজনৈতিক সদিচ্ছা

দেশে সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।। একমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যই পারে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করতে।

মোট কথা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এটি সকলেরই প্রত্যাশা। সে লক্ষ্যে সরকার এবং জনগণকে একত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আরো সচেষ্ঠ হতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় গুনগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।